গভীর সঙ্কটে দেশ

শাহজাহান মিয়া

দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ অদৃশ্য সুতোর টানে প্রভুভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে খালেদা-নিজামী চক্রের স্বার্থরক্ষার ইজারাদারি করে ব্যর্থতার ষোলোকলা পূর্ণ করেছেন। তাঁর উপদেষ্টা পরিষদের ১০ জনের চারজনই পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যোগ দেয়ার ৪২ দিনের মাথায় গত ১১ ডিসেম্বর। জাতি হতবাক। কারণ, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় কখনই এরকম ঘটনা ঘটেনি। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী মনোভাবই এর জন্য দায়ী। এই বিরল ঘটনা দেশকে গভীর সাংবিধানিক সঙ্কটে নিপতিত করে। সকলেই জানেন– ড. আকবর আলী খান, লে. জেনারেল (অব) হাসান মশহুদ চৌধুরী, শফি সামি ও সুলতানা কামাল পেশাগত জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁরা বেশ খোলামেলাভাবেই তাঁদের পদত্যাগের কারণ জাতির সামনে তুলে ধরেন। পদত্যাগের পরে প্রদত্ত বক্তব্যে তাঁরা বলেছেন, উপযুক্ত কাজের পরিবেশের অভাবে তাঁরা উপদেষ্টা হিসেবে ইতিবাচক অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছেন বলেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। বিরাজমান পরিস্থিতিতে দেশের একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাঁরা কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারার মানসিক যন্ত্রণাই তাঁদের স্ব স্ব পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। একথা সবার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই প্রধান উপদেষ্টার অনমনীয় মনোভাব এবং খামখেয়ালিপনা এবং উপদেষ্টাদের সঙ্গে তাঁর ভুল বোঝাবুঝিও দূরত্বের সৃষ্টি করে।

তবে ১১ ডিসেম্বর চার উপদেষ্টার পদত্যাগের ২৪ ঘণ্টা না যেতেই তাঁদের জায়গায় নতুন চার উপদেষ্টা নিয়োগ দেয়া হয়। তাঁরা হচ্ছেন– মেজর জেনারেল (অব) রুহুল আলম চৌধুরী, শফিকুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক মোঃ মঈনুদ্দিন চৌধুরী ও ড. শোয়েব আহমদ এরা সবাই বিএনপি-জামায়াত ঘরানার লোক হিসেবেই পরিচিত। গত ১৩ ডিসেম্বর জনকণ্ঠের প্রধান প্রতিবেদনে এই ঘটনাকে যথাযথভাবেই 'দলীয় রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পূর্ণ দলীয় রূপ নিয়েছে' বলে মন্তব্য করা হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয় .... "এটি হয়ে গেছে বিএনপি-জামায়াত জোট কেয়ারটেকার কেবিনেট।" এই নিয়োগ নিয়েও কথা উঠেছে। তীব্র সমালোচনা হচ্ছে। রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও আইনবিদরা নতুন উপদেষ্টা নিয়োগকে অসাংবিধানিক ও বেআইনী বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, তিন মাসের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাঝপথে নতুন উপদেষ্টা নিয়োগের এখতিয়ার রাষ্ট্রপতির নেই। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ-এর ধারা (১) এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, "প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।" সংবিধানে শুধু ১০ জনের কথাই বলা থাকলেও পদত্যাগের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কি করতে হবে তা বলা নেই। আর সংবিধানে যা নেই তা করার এখতিয়ার কারও একেবারেই নেই। তাই প্রতীয়মান হয় যে পদত্যাগের কারণে উপদেষ্টার সংখ্যা কমে গেলেও বাকি সময় ঐভাবেই চলার কারণ সংবিধানে পদত্যাগজনিত পরিস্থিতির কোনই উল্লেখ নেই। তাই নতুন নিয়োগ সম্পূর্ণভাবেই বেআইনী ও সংবিধানসম্মত নয়।

সাবেক উপদেষ্টাদের প্রণীত একটি প্যাকেজ প্রস্তাবের মাধ্যমে যখন দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে তখন হঠাৎ করে বিনাকারণে সবাইকে বিস্মিত করে এবং উপদেষ্টাদের মতামত উপেক্ষা করে রাষ্ট্রপতির এককভাবে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত সব তছনছ করে দেয়। এবং একটি সোনালি সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে। সংবিধান লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই উপদেষ্টা পরিষদে তাঁর সহযোগীদের মতামতের কোন মূল্য না দিয়ে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন। গত ২৭ নবেম্বর উপদেষ্টাদের না জানিয়ে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করতে নির্বাচন কমিশনকে বাধ্য করেন। উপদেষ্টাদের সুপারিশের কোন মূল্যায়ন না করেই তিনি গত ২২ নবেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। মানুষ বলছে, বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দলীয় রাষ্ট্রপতি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ দখল করে নিরপেক্ষতার আদর্শকে দলিতমথিত করে সদা-সর্বদা তাঁর দলীয় প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট। অথচ গত জুন মাসে তাঁর ওপর খড়গহস্ত হয়ে তাঁর দল যখন তাঁর ওপর মহাতাণ্ডব সৃষ্টি করে তখন সাবেক বিরোধীদলীয় নেত্রীর নেতৃত্বে বিরোধী দল, সুশীল সমাজ ও সাংবাদিকরাই তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার দুঃখ হয় যে, তখন অনেক সাংবাদিক, কলামিস্ট ও লেখকের সঙ্গে আমিও তাঁর পক্ষে কলম ধরেছিলাম। তিনি বিক্রমপুরের সন্তান বলে বোধহয় আমি একটু বেশিই করেছিলাম। এখন ভাবতে কষ্ট হয় যে, এই মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিটির পক্ষে লিখেছিলাম। চার উপদেষ্টার পদত্যাগের ঘটনা ১৪ দলীয় জোটকে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনকে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করতে তাদের আন্দোলন কঠোর করার ঘোষণা দিতে উজ্জীবিত করে। বিএনপি-জামায়াত জোট ব্যতীত দেশের প্রতিটি দল তাদের এক দফা দাবি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। ১৪ দল নেত্রী শেখ হাসিনা ঠিকই বলেছেন যে, শুধু জনগণই নয় তাঁর পরিষদের উপদেষ্টারা প্রধান উপদেষ্টার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং সে জন্য তাঁর পক্ষে অবাধ, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান একেবারেই অসম্ভব। তিনি বলেন, তাঁর জোট আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হচ্ছে যে, এখনও অনেকে সন্দেহ করছেন ১৪ দল নির্বাচনে যেতে পারে। কেউ কেউ একথাও বলছেন, সাবেক বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার পাশে আমীর হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, আবদুল জলিল, মোহাম্মদ নাসিম, রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনুর মতো নেতা থাকলেও তাঁর আশপাশে দু'একজন নেতা আছেন যাঁরা তাঁকে নির্বাচনে যেতে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছেন। তাঁকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার জন্য জনগণ উন্মুখ হয়ে আছেন। একথা শতভাগ ঠিক যে, এবার জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে ভোট আওয়ামী লীগের মার্কায় পড়লেও গণনায় পাওয়া যাবে কিনা তা বলা মুশকিল। কারণ সারাদেশে বিগত সরকার যে জাল বিছিয়ে রেখেছে তা ছিন্ন করা বর্তমান অবস্থায় খুবই কঠিন। মাঠ

পর্যায়ে ইউএনও ও ইলেকশন অফিসারদের সরিয়ে এনে অন্যত্র কাজে লাগিয়ে তাদের জায়গায় সম্পূর্ণ নতুন কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে এদের ষড়যন্ত্রের জাল নস্যাত করা মুশকিল হয়ে পড়বে। সার্বিক অবস্থা নির্বাচন উপযোগী হলেই শুধু নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত বলে অনেকে মনে করছেন। নতুবা নয়। ১৪ দলকে বর্তমান ভোটার তালিকা ও নানা কৌশলের হোতা নির্বাচন কমিশনের কথাও মনে রাখতে হবে। পদত্যাগী উপদেষ্টারা জাতিকে এই ম্যাসেজই দিয়ে গেছেন। তাঁরা সবকিছু খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে দেশের জনগণকে সতর্ক করে গেছেন। আর একটি কথা সকলেই ভাল করেই জানেন যে, সকল দল নির্বাচনে শরিক না হলে নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

কেউই বিশ্বাস করতে চাইছে না যে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন এতটাই দলীয় মনোভাবাপন্ন যে, তাঁর অধীনে কোন অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আদৌ সম্ভব। একজন রাষ্ট্রপতি, যিনি সার্বভৌমত্বের প্রতীক, সংবিধানের রক্ষক ও জাতির বিবেক বলে পরিচিত হওয়ার কথা, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তিনি নিরপেক্ষতার লেশমাত্রও প্রমাণ করতে পারছেন না। মনে হয় এই ভদ্রলোক তাঁর প্রতি জনগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও কোন পাত্তা দিচ্ছেন না। তাঁর বিবেকও মনে হয় তাঁকে দংশন করছে না। তিনি একেবারেই নির্বিকার ও ভাবলেশহীন। এই মুহূর্তে তাঁর জোট বিএনপি-জামায়াতের এজেন্ডা বাস্তবায়নই তাঁর জন্য যেন অবশ্য করণীয় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় ১৪ দল ও অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে যাওয়ার প্রশ্নে এক শ' বার ভাবতে হবে। আর বিএনপি-জামায়াত জোট যদি ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি স্টাইলে নির্বাচন করার চিন্তা করে তাহলে তা তাদের রাজনৈতিক মৃত্যুই ডেকে আনবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

[লেখক সাংবাদিক]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও মিত্রদের অবদান

শাহরিয়ার কবির

(পূর্ব প্রকাশের পর)

রিচার্ড টেইলর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের এই অতুলনীয় কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করেছেন 'ব্লকেড' (Blockade) নামক গ্রন্থে, যা ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল নিউইয়র্ক থেকে। 'ব্লকেড'-এর প্রথম সাতটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, যা বাংলায় অনুবাদ করেছেন মেসবাহউদ্দিন মুনতাসীর।

রিচার্ড টেইলরের 'ব্লকেড' পড়ে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। আমেরিকার নিক্সন প্রশাসন যেখানে বাংলাদেশের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধনের জন্য পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে সব রকম সহযোগিতা করছিল, সেই আমেরিকার সাধারণ মানুষ কিভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এ বইতে। শুধু পাকিস্তানী যুদ্ধজাহাজ অবরোধ নয়, বাংলাদেশের শরণার্থীরা ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে কী মানবেতর জীবনযাপন করেছে– আমেরিকার প্রেসিডেন্টের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার জন্য হোয়াইট হাউসের সামনে শরণার্থী শিবিরের মডেল তৈরি করে ওয়াশিংটনের বাসিন্দারা দিনের পর দিন সেখানে অবস্থান করে অর্ধাহারে কাটিয়েছেন। এক মুঠো চাল আর ডাল রান্না করে খেয়ে তারা অনুভব করতে চেয়েছেন বাঙালীদের দুঃখদুর্দশা। তাঁদের এ সকল কার্যক্রম মার্কিন প্রশাসনকেই শুধু বিব্রত করেনি, বিশ্ববিবেককেও নাড়া দিয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে 'অবরোধ' একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ মিশন ৪০ মার্কিন নাগরিকের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এঁদের ১০ জন হচ্ছেন রিচার্ড টেইলর ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ, যাঁরা '৭১-এ পাকিস্তানী জাহাজে অস্ত্র বোঝাইকরণে অবরোধ সৃষ্টি করে রক্ষা করেছিলেন বহু নিরীহ বাঙালীর জীবন। একই সঙ্গে নিক্সন প্রশাসনের স্বরূপ উন্মোচন এবং মুক্তিযুদ্ধরত বাঙালীদের প্রতি মার্কিন নাগরিকদের সহানুভূতি অর্জনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং তার প্রশাসনকে বোঝাবার জন্য– পাকিস্তান যা করছে তা ঠিক নয়। এই সময়ে তিনি আমেরিকাসহ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেছিলেন উপমহাদেশের পরিস্থিতি তাদের জানাবার জন্য এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন বন্ধ করে তাঁকে মুক্তি দেয়ার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য।

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে আলোচনার সময় শ্রীমতী গান্ধী যখন বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলেন তখন নিক্সন তা উপেক্ষা করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী পররাষ্ট্র সচিব টিএন কল এ প্রসঙ্গে আমাকে বলেছেন, 'মিসেস গান্ধীর কথা শুনে নিক্সন বললেন, শেখ মুজিব কোথায় আমি জানি না। তিনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন তাও জানি না। আপনি তাড়াহুড়ো করে কিছু করবেন না। দু'এক বছর অপেক্ষা করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ভারতের কাঁধে তখন বাংলাদেশের এক কোটি শরণার্থীর বিশাল ভার। যে কোন সময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, অপেক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত সময় তাদের হাতে নেই। নিক্সনের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর আনুষ্ঠানিক বৈঠক ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ, ক্লান্তিকর এবং শীতল। আমেরিকা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে সমর্থন করার ব্যাপারে অনড় ছিল। যদিও বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে তাদের সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করলেও কোন হামলা চালাতে তারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। যার বড় কারণ ছিল ভিয়েতনামে পরাজয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এশিয়ায় আরেকটি রণাঙ্গনে নিজেদের দেশকে জড়িত দেখতে চায়নি।

আমেরিকার নিক্সন সরকার ও প্রশাসন পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও সেখানকার জনগণ, গণমাধ্যমসমূহ এবং সিনেট ও কংগ্রেস সদস্যদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন। সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের ভেতর ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য বেশি হলেও রিপাবলিকান দলেরও বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন সিনেটরদের ভেতর বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন এডওয়ার্ড কেনেডি। ম্যাসাচুসেটসের এই ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্য মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানী সামরিক জান্তার গণহত্যার নিন্দা করেছে,পকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করার জন্য বার বার নিক্সন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং

শরণার্থীদের অবস্থা দেখার জন্য পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, ঝড়, বৃষ্টি কাদা উপেক্ষা করে পায়ে হেঁটে বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেছেন।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ও সিনেটর ফ্রেড হ্যারিস ১ এপ্রিল '৭১ তারিখে সিনেটের অধিবেশনে পাকিস্তানী সামরিক-অসামরিক নিরস্ত্র মানুষের ওপর নির্বিচার হামলা, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবাদ করেছেন, দাবি করেছেন এ বিষয়ে যেন মার্কিন সরকারও উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য প্রদান বন্ধ করে। ১ এপ্রিল থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সব বিষয়ে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি সিনেটে বক্তব্য রাখেন সেগুলোর শিরোনাম হচ্ছে: ১। পূর্ব পাকিস্তান অবস্থার ওপর মন্তব্য (১ এপ্রিল), ২। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় পূর্ব পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ (৩ মে), ৩। ভারতে পাকিস্তানী শরণার্থী (২ জুন), ৪। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা (১৮ জুন), ৫। পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন নীতি (২২ জুন), ৬। শরণার্থী ত্রাণ সাহায্যের বিল ২৫৬৮ (২৩ সেপ্টেম্বর), ৭। পূর্ব পাকিস্তানে সঙ্কট (২৮ অক্টোবর), ৮। পূর্ব পাকিস্তান শরণার্থীদের জন্য বিল ২৭৭৯ (১ নবেম্বর), ৯। পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধ (৮ নবেম্বর), ১০। দক্ষিণ এশিয়া সঙ্কটের মূলে (১৬ নবেম্বর), ১১। দক্ষিণ এশিয়া সঙ্কটে মার্কিন নীতি (৭ ডিসেম্বর) এবং ১২। দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতির ব্যর্থতা (১১ ডিসেম্বর)।

বাংলাদেশের পক্ষে সিনেটে সর্বাধিক সংখ্যক বক্তব্য প্রদান করেছেন ওহায়োর রিপাবলিকান সিনেটর উইলিয়াম স্যাক্সবি। ২৯ এপ্রিল থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে ১৯ বার বক্তব্য রেখেছেন। ১৫ বার বক্তব্য রেখেছেন আইডাহোর ডেমোক্র্যাট সিনেটর ফ্র্যাঙ্ক চার্চ। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৬১ জন মার্কিন সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান সিনেট ও কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে বাংলাদেশের সমর্থনে ১৯২ বার বক্তব্য রেখেছেন। তাদের এই বক্তব্য মার্কিন জনমতকে প্রভাবিত করলেও নিক্সন প্রশাসনকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি। শুধুমাত্র সিনেটে শরণার্থী বিষয়ক সাব-কমিটির চেয়ারম্যান এডওয়ার্ড কেনেডির কারণে ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য আমেরিকা নগদ ও ত্রাণসামগ্রী মিলিয়ে প্রায় নয় কোটি ডলার সাহায্য পাঠিয়েছে। তবে এই সাহায্যের পুরোটাই দেয়া হয়েছে জাতিসংঘের মাধ্যমে, ভারত সরকারকে তারা এ খাতে কোন অর্থসাহায্য করেনি। বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ প্রথম পত্রিকার মাধ্যমেই জেনেছিল আমেরিকার সাধারণ মানুষ। মার্চের প্রথম সপ্তাহে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বিদেশী সাংবাদিক ঢাকা এসেছিলেন, যাঁদের ভেতর আমেরিকার প্রধান প্রধান দৈনিকের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। যদিও পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতের পর থেকে ঢাকায় বিদেশী সাংবাদিকদের গতিবিধি প্রচণ্ডভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাদের হোটেলের বাইরে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়, তার পরও সাংবাদিকরা গণহত্যার বিবরণ সংগ্রহ করেছেন, ছবি তুলেছেন এবং নিজ নিজ দেশে সেসব পাঠিয়েছেন। অন্যান্য পশ্চিমা দেশের মতো আমেরিকার মানুষও পত্রিকার মাধ্যমেই জেনেছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি। ১ এপ্রিল সিনেটর হ্যারিস বাংলাদেশের পক্ষে যে বক্তব্য রেখেছেন তার সূচনা করেছেন নিউইয়র্ক টাইমসের ৩১ মার্চের একটি সংবাদ থেকে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাঙালীরা মুক্তিযুদ্ধের আরম্ভ থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিতে জনমত গঠনের জন্য নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই সব বাঙালীর ভেতর পাকিস্তান দূতাবাস ও জাতিসংঘের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত বাঙালীরা ছিলেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বাঙালী ছাত্ররা ছিলেন আর ছিলেন দীর্ঘকাল যাবত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশার বাঙালীরা, যাঁরা ছিলেন মার্কিন নাগরিক।

ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলিয়ে বাঙালীর সংখ্যা ছিল ২২ জন। যাঁদের ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী শাহ আবু মোহাম্মদ শামসুল কিবরিয়া, আবুল মাল আবদুল মুহিত, এনায়েত করিম, সৈয়দ আবু রুশদ মতিনউদ্দিন প্রমুখ। ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কের পাকিস্তানী দূতাবাসের বাঙালীরা কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হলেন, কিভাবে মার্কিন প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের এবং সাধারণ গণতন্ত্রকামী মানুষদের সমর্থন পেয়েছেন তার প্রামাণ্য বিবরণ রয়েছে আবুল মাল আবদুল মুহিতের 'স্মৃতি অম্লান ১৯৭১' গ্রন্থে।

বিশ্ব জনমত গঠনের ক্ষেত্রে ভারতের সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, একইভাবে বিদেশী গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের শরণার্থীদের দুর্দশা, মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের নিদর্শনসমূহ দেখানোর ব্যবস্থাও ভারতকে করতে হয়েছিল। আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের। বাংলাদেশের পক্ষে মার্কিন জনমত সংগঠনের ক্ষেত্রে সিনেটর এ্যাডওয়ার্ড কেনেডির ভারত সফর খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো যুক্তরাজ্যের আইনসভার সদস্যরা, সাংবাদিক ও ত্রাণ সংস্থার প্রতিনিধিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের দুর্দশা দেখার জন্য ভারতে এসেছেন এবং দেশে ফিরে গিয়ে পত্রিকায় লিখে, পার্লামেন্টে আলোচনা করে, বিবৃতি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠিত করেছেন। শ্রমিকদলীয় এমপি পিটার শোর মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে আমৃত্যু বাংলাদেশের একজন পরম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বিবিসি পালন করেছে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় বিবিসির বাংলা বিভাগের সাংবাদিকরা প্রত্যেকে একেকজন মুক্তিযোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য জন স্টোনহাউস বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। ব্রিটিশ এমপিদের সঙ্গে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার এমপিরাও তখন শরণার্থী শিবিরে এসেছিলেন।

এই সব সফল এবং কূটনৈতিক তৎপরতা যে শুধু সরকারী পর্যায়ে হয়েছিল তা নয়, বাংলাদেশের বাস্তবতা সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহের কাছে তুলে ধরার জন্য সিপিআইর নেতৃবৃন্দকে সেসব দেশে যেতে হয়েছিল। সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। প্রখ্যাত ফরাসী বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মালরো, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, বলেছিলেন বাংলাদেশ যদি মুক্তিযুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সবার আগে তিনি সেই ব্রিগেডে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবেন। ***(চলবে)***

[লেখক সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী]

কোথায় চলেছ তুমি, হে বিপন্ন স্বদেশ

পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বদেশের চেহারায় আমরা আতঙ্কিত। অথচ বিশ্বমিডিয়ার কল্যাণে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। পরপর বেশ কিছু উজ্জ্বল ঘটনাপঞ্জি, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প নিয়ে বিবিসির মিশ্র প্রতিবেদন। অতঃপর নোবেল বিজয়ী ইউনূসের সাক্ষাতকার এবং পুরস্কার গ্রহণের অসামান্য গৌরবমণ্ডিত অনুষ্ঠান। দরিদ্র দেশ ও জাতির জন্য এত পাওনা বোধকরি বেমানান। ঐ দিনই আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে সেনা মোতায়েনের সচিত্র সংবাদে আঁতকে উঠেছি আমরা। ঢাকার রাস্তায় সৈন্য দলের ছবি আর যাই হোক গণতান্ত্রিক দুনিয়ার জন্য অস্বস্তিকর। সেনা মোতায়েন যে কারণে, যে অর্থেই করা হোক না কেন এখন তা সুখদায়ক নয়। তা ছাড়া উপদেষ্টাদের মতদ্বৈধতা, পদত্যাগ বলে দিয়েছে এ সিদ্ধান্ত একনায়কোচিত। স্বভাবতই ক্ষব্ধ প্রবাসীরা এখন বিক্ষোভের আয়োজনে ব্যস্ত। স্থানীয় বাংলা কাগজ সোনার বাংলার উদ্যোগে "জাতীয় পতাকা খাঁমচে ধরেছে আজ পুরনো শকুন" এই শিরোনামে প্রতিবাদ সেমিনার হবে। শুধু আয়োজনই নয়, প্রবাসী বাঙালীদের চিত্তচাঞ্চল্যেও অস্থিরতা প্রকাশিত। বিজয় দিবস স্মরণে যে অনুষ্ঠানগুলোর আহ্বান চোখে পড়েছে এর আয়োজক যারাই হোক না কেন আলোচ্য বিষয় হবে সাম্প্রতিক বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে প্রবাসীদের দ্বিমত ভূমিকার বিশ্লেষণ। বলা বাহুল্য, দেশ ছেড়ে দেশান্তরী হলেই দায়িত্ব চুকে যায় না। মাতৃভূমির যে কোন বিপন্নতায় সন্তান পাশে দাঁড়াবেই, তা সে যতদূরেই হোক না কেন।

অভ্যুত্থানের ফিজি ॥ চেহারা কি মিলে যাচ্ছে?

রক্তাক্ত না হলেও অভ্যুত্থানকবলিত ফিজি এখন প্রশান্ত পারের সংবাদ শিরোনাম। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশটিতে অর্থনীতির পালে হাওয়া নেই। এককালের প্রসিদ্ধ কৃষি তথা ইক্ষু ধ্বংসপ্রায়। হুমকির মুখে পোশাক শিল্প। উপার্জনের প্রধানতম অবলম্বন পর্যটন শিল্পের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে এই ক্যু। ক্যু কেন? না, কোন সদুত্তর নেই। সেনাপ্রধান কমোডর বলছেন, দুর্নীতিই মুখ্য কারণ, বলছেন বটে জনগণ তো এখনও লাইসেনিয়া কারাসেরই পক্ষে। বিদায়ী সরকারপ্রধান চলে গেছেন নিঝুম দ্বীপে। নিজের জন্মস্থানে, জানেন কে ফিরে এসেছেন? সেই রামবুকা নব্বই দশকে যার অভ্যুত্থানের বদৌলতে প্রথম ফিজির নাম শুনেছিলাম। অর্থাৎ অভ্যুত্থানকারীরা এক জোট। এখন দেখতে হবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহেন্দ্র চৌধুরীর সরকারকে উৎখাতকারী জর্জ স্পেটের অবস্থা কি দাঁড়ায়। ফিজির অভ্যুত্থানের নেপথ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেধার সাথে আদিবাসী ফিজিয়ানদের সংঘাত আর ক্ষমতার লোভ যাই যাক না কেন এরা এখন তোপের মুখে। দুই শক্তিশালী প্রতিবেশী অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডসহ দাতা দেশগুলোর অনুদান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কমোডর তোয়াক্কা না করলেও ফিজির আকাশে নামবে দুর্যোগের ঘন মেঘ। মিডিয়াগুলোতে চলমান সেনাদলের ছবি দেখতে দেখতেই পাওয়া গেল দেশের খবর। একই চিত্র প্রায়। হতবিহ্বল, সন্ত্রস্ত্র জনগণের চোখের সামনে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে জলপাই বাহিনী। কার নিরাপত্তা, কার কল্যাণে? কেউ জানে না।

সুরের অমিয় ধারা ॥ সিডনিতেও নজরুল চর্চা

সিডনির বাঙালীও সংস্কৃতি চর্চায় পিছিয়ে নেই। হোক বাংলাহীন জগত, এর ভেতরও প্রবহমান ধারাটি চোখে পড়ার মতো। সাপ্তাহিক অপরাহ্ণ এবং সন্ধ্যাগুলো এখন অনুষ্ঠানমালার প্রাবল্যে জনাকীর্ণ। লিভারপুলের লাইব্রেরী মিলনায়তনে গিয়ে তারই চাক্ষুষ প্রমাণ মিলল, অমিয়া মতিন সিডনি প্রেক্ষাপটে জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী, তাঁর বিশেষত্ব নজরুলে, দূর প্রবাসে সাধনায় নিমজ্জিত অমিয়ার কণ্ঠ শুনে মনে হলো সত্যদ্রষ্টা কবি ঠিকই বলেছিলেন "আমারে দেব না ভুলিতে"। বাঙালীর দ্রোহ যার বেদনার কবি নজরুলকে প্রবাসে জাগিয়ে রাখার সতেজ সুরধারাটি যিনি তৈরি করেছেন তিনি এক অবাঙালী সুরকার। কিরণ প্রধান অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভারতীয়। হিন্দী ভাষী, যথাযথ মূলানুনগ সুর আর আবহ সৃষ্টি করে নজরুলকে উপস্থাপন করার ভেতর দিয়ে আরও একবার প্রমাণ হলো সঙ্গীতের কোন সীমারেখা নেই। সুরের ইন্দ্রজাল ভাষাহীন আন্তর্জাতিক। এই অনুষ্ঠানের নান্দনিক মঞ্চসজ্জা, সংক্ষিপ্ত, বাহুল্যবর্জিত উপস্থাপনা আর অমিয়া মতিনের সুপরিবেশনা মিলনায়তনের দর্শক-শ্রোতার মন ভরিয়ে দিয়েছে। উপলক্ষ যদিও তাঁর সদ্য নির্মিত গানের সিডি 'আশা পথ চাহি'র উন্মোচন। এর বাইরেও পাওনা ছিল শিশুশিল্পী, তরুণ প্রজন্মের নাচ ও অনুরোধের গান। সিডিটির মোড়ক উন্মোচন করেন দূতাবাসের অনারারি কনসাল জেনারেল এন্থনি কুরি। এ উপলক্ষে স্থানীয় বিশিষ্টজনেরাও সাফল্য কামনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। সিডনির বাংলা তথ্য প্রবাহে উল্লেখ্য, ইন্টারনেট মিডিয়া সিডনিবাসী বাংলাপ্রধান আবদুল মতিনের প্রসন্ন অবয়বই বলে দিচ্ছিল অনুষ্ঠানের সার্থকতার তৃপ্তি। নজরুল গীতির 'আশা পথ চাহি' অভিবাসন অমিয়াকে প্রত্যাশার শীর্ষে নিয়ে যেতে পারলে প্রবাসী বাঙালীদেরই লাভ।

মানবাধিকার দিবস ॥ বাংলাদেশ তুমি একা নও

অস্ট্রেলিয়ান ফোরাম ফর মাইনরিটিজ ইন বাংলাদেশের উদ্যোগে পালিত হলো বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। স্থানীয় একটি পাবলিক স্কুল মিলনায়তের এই অনুষ্ঠানটি দুটো কারণে তৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত বিরাজমান দেশীয় রাজনীতির জটিল প্রেক্ষাপট, শেষত বিশ্ব মানবাধিকারের নামে এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ। বক্তাদের আলোচনায় এ প্রসঙ্গগুলোই উঠে এসেছিল বিশেষত পুলি ও বাংলাদেশে সুপরিচিত শরণার্থী অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আইনজীবী ডেভিড বিটেলের বক্তব্য। সোনার বাংলা পত্রিকার সম্পাদক পিএস চুন্নুর তথ্যমূলক বক্তব্যও ছিল প্রণিধানযোগ্য। বক্তারা বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন, সংখালঘুসহ প্রগতিশীল সংখ্যাগুরু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার মতামত রাখেন। জাতিসংঘ প্রণীত ধারার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করে নির্যাতন প্রতিরোধের ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ড. সমীর সরকার। দ্বিতীয় পর্বে প্রদর্শিত ভিডিওচিত্রটি ছিল হৃদয়বিদারক। দু'হাজার এক সালে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত শাহরিয়ার কবিরের অনবদ্য নির্মাণ। ফেনীর তৎকালীন ঘটনা প্রবাহ বিস্ফোরণের সাক্ষী। প্রয়াত সাংবাদিক নারায়ণ সেনগুপ্তের সাহসী বর্ণনা বারংবার তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল। শেষ পর্বের আবৃত্তি ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের পাশাপাশি বড়দের অংশগ্রহণ দিয়েছে পূর্ণতা। মানবাধিকার প্রশ্নে ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি স্বদেশের পাশে দাঁড়িয়ে

এঁরা কর্তব্যের নজির রেখেছেন। দেশবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন এঁদের সম্পাদক অনিল নাথ।

[লেখক ছড়াকার ও সাংবাদিক]
dasguptaajoy@hotmail.com

জীবনকথন

বিষে বিষক্ষয়, মধুতে শর্করালয়

রণজিৎ বিশ্বাস

: তুমি না সাহিত্যের ছাত্রী?!
: সন্দেহ আছে তোমার!
: মাঝেমধ্যে হয়, কিন্তু অঙ্গবিকৃতির ভয়ে বলি না।
: তুমি এখন জানতে চাচ্ছটা কি!
: গীতবিতান-এর নাম শুনেছ?
: মহা মুসিবৎ! আমি শুনব না তো কি তুমি শুনবে!
: এ বছর যে 'গীতবিতান' প্রকাশের পঁচাত্তর বছর পুরো হলো, তুমি জান?
: না, জানি না।
: আমার কাছে শোন। ১৯৩১ সালে এর প্রকাশ। এ বছর ২০০৬ সাল, বুঝতেই তো পারছ তাহলে কী হচ্ছে, কী হচ্ছে না।
: কী হচ্ছে না?
: এই পবিত্র গ্রন্থের প্রকাশনা উপলক্ষে ঢাকায় কিংবা চট্টগ্রামে একটি উদ্‌যাপনের আয়োজন হতে পারত।
: তুমি বড় বাজে লোক।
: তোমার কাছে তো এটি নতুন সংবাদ নয়!
: তারপরও তুমি বাজে লোক। অনেক বড় সাইজের বাজে লোক। তুমি বিবাহের সময় অন্নপ্রাশনের কথা বল। এখন কি মানুষের সে অবকাশ আছে? চারপাশে তাকাও না তুমি! বাতাসে কান পাত না তুমি! কাগজে চোখ পড়ে না তোমার! গায়ে ফোসকা পড়ে না তোমার!
: তোমার কি মনে হয় আমি একটা ইডিয়ট?
: আমার তো মনে হয় সেটি হতেও সময় লাগবে তোমার। ক্ষিধেয় যখন আঁত ছেঁড়ে, তখন কী খোঁজে মানুষ? ভাতের থালা, না রকমারি শাড়ি?
: মানুষ কী খোঁজে জানি না। যার সঙ্গে আমার বসবাস, সে কিন্তু পরেরটাই খোঁজে।
: তোমার কথা শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না।
: স্থির থাকতে পারছ না কেন তুমি?
: আমার হাত বড় নিশপিশ করছে।
: তেমন করার কারণ কি!
: তোমার পিঠে ধমাধম ওষুধ প্রয়োগের জন্য। চালতা বরাবর।
: কী ওষুধ?
: যার ওপর কোন দাওয়াই নেই।
: সে দাওয়াই আবার কেমন দাওয়াই?
: বাঁকা প্রাণী সোজা করার দাওয়াই। অসমতল পিঠ–সমতল করার দাওয়াই।
: তোমার হাতে যদি হঠাৎ কিছু পয়সা আসে, তুমি কি করবে?
: আমি একটা হামানদিস্তা কিনব।
: হামানদিস্তা দিয়ে কি করবে?
: বেছে বেছে মানুষ ছ্যাঁচব। নিজের ঘর থেকেই শুরু করব।
: নিজের ঘর থেকে কেন?
: ভাল কাজ পুণ্য কাজ আর সৎকাজ নিজের ঘর থেকেই শুরু করতে হবে। সেটিই নিয়ম।
: ঘরে তোমার ছ্যাঁচা খাওয়ার মতো কি আছে? কে আছে?
: আছে। জবরদস্ত এক শয়তান আছে। তার হাত-পা সবার আগে গুঁড়ো করব।
: তাতে তোমার কি লাভ?
: হাত-পা লুলা করে আতুর পালব। আতুর পালায় অনেক সুখ।
: হাত-পা ভেঙ্গেই শুধু ক্ষান্তি দেবে?
: না। মাথার চাঁড়াও গুঁড়ো করব তার।
: তারপর?
: তারপর তার মগজ বার করে বড়া বানাব। সেই বড়া গরম ভাতের সঙ্গে মসুর ডাল দিয়ে অথবা পান্তাভাতের সঙ্গে নুন আর মরিচপোড়া দিয়ে গপাগপ গিলব, দলাদলা গিলব।
: আমার হাতে যদি প্রচুর পয়সা আসে, আমি তেমন উদ্ভট কিছুই করব না। আমার অন্য ধরনের প্ল্যান আছে। খুব বড় দু'টি প্ল্যান।
: কী কী প্ল্যান?
: আমি একটি লাইব্রেরী করব, আর একটি ল্যাবরেটরি।
: কিসের লাইব্রেরি?

: ইতিহাসের লাইব্রেরী।
: ইতিহাসের লাইব্রেরী দিয়ে কি হবে?
: আলমারিতে বইগুলো অনুপদ্রুত থাকবে। অনাঘ্রাতা কুমারীর মতো। কারও তাতে হাত পড়বে না। বইগুলো চিরদিন নতুন থাকবে। বইগুলো হারাবে না, সেগুলোয় কারও হাত পড়বে না। সেগুলো কেউ ধারও নেবে না।
: হাত পড়বে না কেন!
: কারণ, বইগুলো ইতিহাসের বই। ইতিহাসের বইতে কারও হাত পড়বে না। সংসারের নিয়ম। সবাই সবকিছু পড়ে, কিন্তু ইতিহাস কেউ পড়ে না।
: পড়ে না কেন?
: পড়ে না ভয়ে।
: কিসের ভয়?
: দু'ধরনের ভয়। কেউ পড়বে না বিভ্রান্ত হওয়ার ভয়ে ও সত্য কিছু জেনে ফেলার ভয়ে। আরেক দল পড়বে না ভুল থেকে কিছু শিখে ফেলার ভয়ে।
: যদি তারপরও কেউ পড়তে চায়?
: সে ব্যবস্থাও আছে। তখন বইয়ের ধরন পাল্টে ফেলব। তখন শুধু মুক্তিযুদ্ধের বই ঢোকাব। এখনও ওটিই এমন এক সাবজেক্ট, যা কেউ নিজেও পড়ে না, সন্তানদেরও পড়তে দেয় না। বুদ্ধিটা কেমন?
: ইডিয়টের মতো।
: ইডিয়ট হওয়া কিন্তু ভাল। ইডিয়টদের শত্রু থাকে না। তাদের সবাই ভালবাসে, আর নিরাপদ ভাবে। নিরাপদ ভাবে বলে আদরে সোহাগে মমতায় ও পৃষ্ঠপোষণায় জড়িয়ে কাছেও রাখতে চায়। তাদের তরক্কিত ভাল হয়।
: আর ল্যাবরেটরি কেন বানাবে?
: মহান এক উদ্দেশ্যে। মানুষের এ্যাসিড টেস্ট করার জন্য।
: তাতে কি হবে?
: মানুষের জন্মঠিকুজি ও বংশঠিকুজি পরিষ্কার হবে।
: এই পরীক্ষার জন্য কি ধরনের এ্যাসিড প্রয়োজন হবে?
: খুব মূল্যবান দুটো এ্যাসিড। রিভোনিউক্লিয়িক এ্যাসিড ও ডি-অক্সি রিভোনিউক্লিয়িক এ্যাসিড।
: এই পরীক্ষা কি খুব জরুরী?
: অবশ্যই জরুরী। এতে ভাল ব্যবসাও হবে। পরীক্ষা করে আমি বিভিন্ন হিউম্যান স্পেসিমেনের ভালত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারব এবং বিভিন্ন মিলে ফ্যাক্টরিতে ভাল ভাল মানুষ সাপ্লাই দিতে পারব। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামাব ও হাঁড়ি হাঁড়ি মধু খাব। কামানো টাকা আবার ব্যবসায়ে ঢালব, সে টাকা দিয়ে আবার টাকা তুলব। সংসারের সব অভাব দূর করব।
: কিন্তু মধু খাবে কেন?
: দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্য। মধুসেবন মানুষকে দীর্ঘজীবী করে। আমি মানুষের এক শ' সাতষট্টি বছর বাঁচার রেকর্ডটি ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করতে চাই।
: কিন্তু তোমার তো মধুমেহ আছে!
: থাকুক। বিষে যেমন বিষক্ষয় হয়, তেমনি মধুতে হবে শর্করালয়। দেহের কোষে কোষে মধুমেহর অমেয় স্নেহ নিয়ে যমের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে আমি সার্ধশতাধিক বছর বেঁচে থাকব জগতসংসারের মধুমেহ তাড়িয়ে বেড়াবার জন্য। মানুষ আমাকে বুঝুক না বুঝুক, আমার উদ্দেশ্য কিন্তু মহৎ। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষকে সামান্য ঝুঁকি নিতেই হয়। সে দম আমি সঞ্চয় করছি।
[লেখক কথাসাহিত্যিক।]